নারীর প্রতি পুরুষের আচরণ

চিররঞ্জন সরকার

নারীর প্রতি পুরুষের আচরণ কেন সহিংস, কর্তৃত্বপরায়ণ, যৌনকামনাযুক্ত, অবজ্ঞাসূচক, রসিকতাপূর্ণ হয়? পুরুষরা কেন এমনটা ভাবে? নারী কি তাদের কাছে যৌনবস্তু ছাড়া কিছু নয়? এর ব্যাখ্যা কী? কারণই-বা কী?

আমাদের সমাজে নারীর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি খুবই নেতিবাচক। একজন মেয়ে রাস্তা দিয়ে একা হেঁটে যাওয়া মানে অসংখ্য পুরুষের কামার্ত, বিকৃত দৃষ্টিকে মোকাবিলা করে পথচলা। বেশির ভাগ ছেলে বড়ো হয় নারীকে কেবল ভোগ করার, আনন্দ করার উপযোগী মাংসপিণ্ড ভেবে। বন্ধুপরিমণ্ডলে কমবেশি সবাই নারীর শরীর নিয়ে আলাপ করে, আলাপ করে সৌন্দর্য ও কাম নিয়ে। খুবই তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে অবলীলায়। বেশির ভাগ বন্ধুসভা বা আড্ডায় এমনটাই হয়। নারীকে মানুষ হিসেবে দেখবার শিক্ষা খুব কম পুরুষেরই আছে। অনেকে বলেন, পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমরা পুরুষরা কি সত্যিই নারীর প্রতি ইতিবাচক বা স্বাভাবিক আচরণ করি? সমাজবিজ্ঞানে একটা ধারণা আছে 'সেক্সুয়াল ইন্টারঅ্যাকশন কম্পিটেন্সি' বলে। এই ধারণায় কেবল যৌন আচরণ অর্থে নয়, বৃহত্তর অর্থে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সুস্থ আচরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। বলা হয়, যেভাবে অক্ষরজ্ঞান শিখতে হয়, কম্পিউটার শিখতে হয়, কোনো বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করব না করব, তারও একটা শিক্ষা আছে। সে শিক্ষা পরোক্ষভাবে পরিবার থেকে আসে, পঠনপাঠনের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া রুচিবোধ, নীতিবোধ থেকে আসে, আসে ধর্মবোধ থেকেও। অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়ের ওপর প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও তা অর্জন করার ব্যবস্থা করা হয়। যেসব পুরুষের কোনো সূত্র থেকেই সেই শিক্ষাটা আসে না, তারা পরিণত হয় প্রবৃত্তিসর্বস্ব, লিঙ্গসর্বস্ব এক একটা বেকুব জন্তুতে। তারা সুযোগ পেলেই হামলে পড়ে নারীর ওপর, তাদের শরীরের ওপর।

আমাদের দেশে প্রগতিশীল চিন্তাধারা যেন একটা সীমাবদ্ধ বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। দেশের ভেতর একটা সাংস্কৃতিক মেরুকরণ চলছে। মেয়েরা তাদের পোশাক, আচরণ ইত্যাদি দিয়ে পুরুষদের বর্বর আচরণে প্ররোচিত করে এমন কুযুক্তি দেওয়ার মানুষও এ দেশে কম নেই। ফলে নারীর ওপর যেকোনো নির্যাতন ও আক্রমণ সমাজের বেশির ভাগ মানুষের কাছে সমর্থন পেয়ে যায়। এর পেছনে রয়েছে লিঙ্গ রাজনীতি। এ রাজনীতি কী করে আরো বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। মনস্তাত্ত্বিকেরা দেখিয়েছেন, নারীর ওপর পুরুষের এই ধরনের আক্রমণের পেছনে শুধু যৌনতৃপ্তি নয়, বরং আছে শক্তি প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা। একজনকে দুর্বল অবস্থানে কোণঠাসা করে এ ধরনের শক্তি

প্রদর্শনের ভেতর আছে সীমাহীন দেউলিয়াপনা, কাঙালপনা ও হীনম্মন্যতা। ভাবনার ব্যাপার এই যে, আমাদের এই সমাজ ও পরিবার এমন হীন, দেউলিয়া, জঘন্য পুরুষদের বেড়ে ওঠবার সুযোগ দিচ্ছে।

নারীকে অবজ্ঞা-উপেক্ষা-তাচ্ছিল্য এবং শোষণ-নির্যাতন করলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তা স্বীকার করে না। নারীর অপমানকে, নিপীড়ন-নির্যাতনকে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সাধারণত ঢেকে রাখতে চায়, আড়াল করে রাখতে চায়। কেন? কারণ তা না হলে পুরুষের হিংস্র চেহারাটা বেরিয়ে আসবে। লাম্পট্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আমরা যত বড়ো লম্পটই হই না কেন, লাম্পট্যকে ঢেকে রাখতে চাই। বরং চান্স পেলে নিজেদের লাম্পট্যের দায় নারীর স্বভাব, আচরণ, চরিত্র বা পোশাকের ওপর চাপিয়ে নিজেকে সাধু প্রমাণ করতে চাই!

তাই তো নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি কিংবা ধর্ষণের ঘটনাগুলোকে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সব সময়ই লুকিয়ে রাখতে চায়। প্রয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়; যেমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে বিবিসি কর্তৃক নির্মিত বহুল আলোচিত তথ্যচিত্র "ইন্ডিয়া'স ডটার" প্রদর্শনে। যাঁরা নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছেন এবং যার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হচ্ছে, দুই দিককেই একদম স্পষ্ট ঝকঝকে দেখা যায়। কে কী বলতে চায় বা চায় না, সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র ধোঁয়াশা থাকে না। ধর্ষণ, নারী নির্যাতন হতেই পারে, হবেও-বা। কিন্তু সেটা জানাজানি হবে কেন? জানাজানি হলে যে পুরুষতন্ত্রের গায়ে আঘাত লাগে। এটা কি হতে দেয়া যায়? আমরা 'ব্যাটা' না? বিকার যখন এত ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, এত সুগভীরপ্রোথিত, নিরাময়ের অতীত, তখন সেটাকে লুকিয়ে রাখাই তো ভালো!

আমাদের দেশে নারীরা আজো পুরুষতন্ত্রের ক্রীড়নক। পুরুষতান্ত্রিকতার জাল ধর্ম-বর্ণ-জাত এমনকি লিঙ্গভেদেও এমন বহুধাপ্রসারিত, যেখানে মেয়েদেরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুরুষতন্ত্র প্রবিষ্ট। একই বিশ্বাসে তাদের পুত্রকন্যারা প্রতিদিন জারিত। তো, এই দেশের কোনো মেয়েই কি আলাদা সত্তা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে? পারে না। তাই তো এখানে মেয়েরাও পুরুষতন্ত্রের শেখানো বুলি উচ্চারণ করে। যে পুরুষতান্ত্রিকতার ছক ভাঙতে চায়, নারীরাই সবার আগে তার শত্রুতে পরিণত হয়। ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সাজ-পোশাক-আচরণ-চরিত্রকে আঘাত করতে। পুরুষতন্ত্র যে নারীকেও পুরো কব্জা করে ফেলেছে!

তাহলে কীভাবে হবে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইটা? আর এ লড়াইটা করবেই-বা কে? কোথায় যাবে পুরুষতন্ত্রের লালসার শিকার নারীরা? পুরুষালি বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইটা তাই কঠিন।

নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ এগুলো একেকটা ব্যাপকতর পুরুষতান্ত্রিক অসুস্থতার প্রকাশ। সেই অসুস্থতা, যার আরেক নাম পুরুষতান্ত্রিক বিকার, সেটা তো শ্রেণি-ধর্ম-জাত-গোষ্ঠী সব ছাপিয়ে রমরমিয়ে বিরাজমান, সদরে-অন্দরে-বাজারে-বাড়িতে।

তাই সবার আগে পুরুষতন্ত্রকে বোঝা দরকার। একটা সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আমাদের সংস্কৃতিতে একটু একটু করে নারীবিরোধী উপাদান যোগ করা হয়েছে। নারীর প্রতি বৈরী মানসিকতা, সহিংসতা ও বৈষম্যের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে, সেটা হলো পুরুষতন্ত্র। পুরুষতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ নয়। পুরুষতন্ত্র শব্দটিতে পুরুষ আছে বলেই এই তন্ত্রের নাম উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুরুষ আর নারী এই দুই ভাগে দুনিয়াটাকে বিভক্ত করে ফেলি। আমরা ভাবি পুরুষ এই তন্ত্রের

প্রবক্তা ও ধারক-বাহক আর নারী এই তন্ত্রের গিনিপিগ, অত্যাচারিত-শোষিত সত্তা। তাই পুরুষ যে অত্যাচার করে সেটাকে খুব স্বাভাবিক মনে হয়, নারী নারীর প্রতি অত্যাচার করলেই মনে হয়, 'আরে, এটা তো করার কথা না, মেয়ে হয়ে মেয়ের ওপর শোষণ!' কিন্তু ব্যাপারটা কি আসলে তা-ই?

পুরুষ অবশ্যই এই তন্ত্রের প্রবক্তা, কিন্তু দুনিয়াজুড়ে সকল পুরুষই এই তন্ত্রের ধারক এই চিন্তায় ভুল আছে। পুরুষতন্ত্র একটা প্রক্রিয়ার নাম। এটা কোনো একক পুরুষের সৃষ্টি না আবার এককভাবে এটার ধারক-বাহক শুধু পুরুষ, এই ধারণাও সঠিক না। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পুরুষ-নারী দুজনেই সংযুক্ত এবং হাজার বছর ধরে উভয়েই এই প্রক্রিয়াটাকে সচল রেখে আসছে।

পুরুষতন্ত্রে শুধু নারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, পুরুষদেরও ভুগতে হয়। পুরুষতন্ত্রই পুরুষকে মানুষ হতে দেয় না, মাংসলোভী পুরুষ বানিয়ে রাখে। পুরুষতন্ত্রই পুরুষকে বলে তোমাকে আঘাত পেলেও চুপ করে থাকতে হবে, কাঁদতে তোমার মানা। পুরুষতন্ত্রের কারণেই সম্ভবত পৃথিবীটা অত্যাচারী ছেলেদের দখলে। অভিজ্ঞতা বলে, আমাদের সমাজে যেই ছেলেটা দুর্বল, অসফল ও ভালোমানুষ তার জন্য পৃথিবীটা ঠিক ততখানি শক্ত, যতখানি একটা মেয়ের জন্য। এই তন্ত্রের দ্বারা উভয়েই যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি আবার এটার সঙ্গে উভয়ে যুক্তও আছে। তাই একজন নারী যখন অন্য নারীকে অত্যাচার করে, তখন সে সেটা করে পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহক হিসেবে। সমস্যাটা কোনো একক নারীর নয়, সমস্যাটা আমাদের সমাজের মূলে। পুরুষতন্ত্রের বিষবৃক্ষ ধরে নাড়া না দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে মনে হয় না।

জন্মগ্রহণের পর আমরা সামাজিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেই সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নারী বা পুরুষ হয়ে উঠি। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তটা আসে পুরুষের কাছ থেকে, কিন্তু এর বাস্তবায়নের সঙ্গে পুরুষ-নারী উভয়েই যুক্ত। এখানে নারী নারী হিসেবে যুক্ত নয়, যুক্ত পুরুষতন্ত্রের বাহক হিসেবে।

পুরুষ শুধু পুরুষের প্রতি অথবা নারী শুধু নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে এই ধারণাটিও ঠিক নয়। যে সহানুভূতিশীল সে যে কারও প্রতিই হয় বা হতে পারে। অভিজ্ঞতাও এখানে একটা ফ্যাক্টর। অনেক সময় একইরকম অভিজ্ঞতা অন্যের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল করে তোলে। আসলে সমাজের রীতিনীতিগুলোকে আমরা এমনভাবে আমাদের মনে গেঁথে নেই বা গেঁথে দেওয়া হয় যে এর অন্যথা হলেই সেটাকে ভুল ভাবি, নিজেদের রীতিনীতিগুলোকে প্রশ্ন করতে পারার ক্ষমতাকে সুকৌশলে খুব ছোটবেলায়ই নষ্ট করে দেওয়া হয়। সেটা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে।

সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সামাজিক অনুশাসনগুলো (স্টেরিওটাইপ ধারণাগুলোকে) টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সকলের ভূমিকা ও কাজ যেন অনেকটাই নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। গ্রামের মোড়লরা যেমন কোনো মেয়ে স্কুলে যায় বলে, মুখেমুখে কথা বলে বলে, কাউকে ভালোবাসে বলে দোররা মেরে 'সমাজ' টিকিয়ে রাখার কাজ করে; তেমনি নারীরাও পাশের বাড়ির মেয়েটি কী করল, কী পোশাক পরল, কার সঙ্গে কথা বলল সেসবের হিসেব রেখে 'সমাজ' টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করে। যে কারণে পাড়ার মুদি দোকান বা চায়ের দোকানে বসে পাড়ার পুরুষ-অভিভাবকরা হিসেব করে কোন ছেলে ভালো বেতন পায়, কোন মেয়ে শরীরের কতখানি বের করে কাপড় পরে। ঠিক একই কারণে পাড়ার জ্যেষ্ঠ নারীসদস্যরাও হিসেব কষে কার সঙ্গে কে ঢলাঢলি করে, কার কবে বিয়ে হবে, বাচ্চা হবে বা হবে না। তারা এটাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে। তারা এ-ও মনে করে, সমাজটাকে উচ্ছন্নে

যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে তারা মহৎকর্ম সম্পাদন করছে। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কোনো ব্যাপার নয়। অল্প কিছু মানুষ ছাড়া সবাই মোটামুটি সমাজের তৈরি এই ভয়াবহ দুঃসহ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

এখানে মনে রাখা দরকার, একজন নারী যখন আরেকজন নারীকে অত্যাচার করে তখন সে নারী হিসেবে করে না, করে পুরুষতন্ত্রের ধারক হিসেবে। আবার অবস্থাভেদেও প্রতিটি মানুষের অবস্থান বদল হয়। যেমন মেয়ের মা হলে সে শোষিতের দলে আবার একই মা ছেলের মা হিসেবে শোষক হয়ে ওঠে। মজার ব্যাপার হলো, পুরুষতন্ত্র নারীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আবার নিজেরাই বলে, দেখো, তোমরা মেয়েরাই কিন্তু মেয়েদের শত্রু। এটা পুরুষতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখারই এক দারুণ কৌশল।

মনে রাখা দরকার যে, 'নারীরাই নারীর শত্রু' এটা ভয়াবহ রকমের পুরুষতান্ত্রিক ও স্টেরিওটাইপ একটি চিন্তা। এই চিন্তা নারীর মধ্যেও সঞ্চালন করা হয়। যে নারী (শারীরবৃত্তিক দিক থেকে) এই কথাটা উচ্চারণ করেন, তিনিও আসলে পুরুষের বানানো কথাটা পুরুষতন্ত্রের স্বার্থে পুরুষ হয়েই উচ্চারণ করেন। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারী কেমন হবে সেই সিদ্ধান্ত যেমন পুরুষের, তেমন নারী কী করবে, কী পরবে, সেই সিদ্ধান্তও তাদের। এটা খুবই জটিল একটা প্রক্রিয়া। ঠিক এই কারণে পুরুষের চাইতে নারীর মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রামটাও দ্বিগুণ। সে যদি মনে করে সে সন্তান না নিয়ে কাজে মন দেবে, তাও তার মধ্যে দ্বিধা কাজ করে। কারণ পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব তার মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি করে যে সে 'চিরন্তন নারীর দায়িত্ব' পালন করতে পারল না। আবার সে যদি চায় সে শুধু তার সন্তানকেই সময় দেবে, তাহলে সে নিজেকে তার পুরুষ সঙ্গীর চাইতে অধম মনে করে, কারণ পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো নারীবাদ শিখিয়েছে যে তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। এই দোটানা থেকে বের হওয়ার সংগ্রামে নারীকে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হতে হয়।

'নারীই নারীর শত্রু' কথাটা সমাজে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এটার প্রমাণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি যে চিত্রটাকে সামনে আনা হয় সেটা হলো শাশুড়ির হাতে পুত্রবধূর নির্যাতন। কেন একজন শাশুড়ি তার পছন্দ করে আনা পুত্রবধূর ওপর চড়াও হন? কেন তিনি একজন মেয়ে হয়ে আরেকজন মেয়ের প্রতি সহনশীল, ধৈর্যশীল হতে পারেন না? এর মনস্তত্ত্বটা অত্যন্ত জটিল। শাশুড়ি হিসেবে যে নারী ভূমিকা রাখেন তিনি আমাদের গড়া এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজেই বড়ো হয়েছেন। তার বড়ো হওয়ার প্রতিটা পদে তিনি জেনে এসেছেন যে এই জগৎটা ছেলেদের জন্য, যেখানে মেয়েদের স্থান নেই। মেয়ে হয়েও এখানে কিছুটা অবস্থান তৈরি করা যায় শুধু পুত্রসন্তান জন্ম দিতে পারলে! তাই একজন নারী যখন পুত্রসন্তানের মা হন, তখন তিনি ভাবতে থাকেন হয়ত তার সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হলো। পুরুষের জগতে তিনিও যেন কিছুটা ক্ষমতা পেলেন। কিন্তু সেই ক্ষমতা দেখাবেন কোথায়? কোনো পুরুষের ওপরে তো সেটা দেখানো যাবে না! স্বামীর বাড়ির কারো ওপরেও না!। তাহলে? শেষমেশ শাশুড়ির সদ্যপ্রাপ্ত ক্ষমতার বলি হয় নববধূ। এখানে শাশুড়ি পুত্রবধূকে মেয়ে হিসেবে নির্যাতন করেন না, বরং তার এতদিনের জমে থাকা না পাওয়ার আক্ষেপ আর স্বল্পবুদ্ধিতার কারণে নির্যাতন করেন। নির্যাতিত পুত্রবধূটির সেই অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। সে মুখ বুজে সব সহ্য করে আর প্রার্থনা করে একটা পুত্রসন্তানের জন্য। সময় ঘুরে সেই পুত্রবধূও আবার শাশুড়ি হয়। এভাবে পুরুষতন্ত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ অত্যাচার চক্র চলতে থাকে। পুরুষতন্ত্র পৃথিবীটাকে অনেক কঠিন বানিয়ে রেখেছে।

আমাদের দেশে মেয়েদের পদে পদে পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়। তাই নিজের গুণ প্রকাশ করার ক্ষমতাও তাদের যেমন কম থাকে, দোষ প্রকাশের ক্ষমতাও থাকে কম। আবার পুরুষের ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয় যে সে একটু খারাপ হবে। ছেলেদের আমরা সামাজিকভাবেই 'বেনিফিট অফ ডাউট' দিয়ে দিই। 'ছেলেরা একটু খারাপ হতেই পারে' ধরনের চিন্তা এতটাই স্বাভাবিক যে, সমাজ থেকে এই স্বীকৃতির সুযোগ নিয়ে ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে অন্যায় করে চলে। এভাবে পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতি নারী ও পুরুষের জন্য একটা অসম পরিবেশ ও সমাজ গড়ে তুলেছে। নারীর প্রতি পুরুষের আচরণটাও তাই স্বাভাবিক না হয়ে সব সময়ই কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠে।

নারীর প্রতি পুরুষের এই আচরণ পরিবর্তন করা ছাড়া, নারী-পুরুষ সাম্যাবস্থা তৈরির মাধ্যমে সমতা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সমাজের সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর সেটা তৈরি করতে হলে সবার আগে পুরুষতন্ত্রের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলোকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। পুরুষতন্ত্র শুধু মেয়েদের অত্যাচার করেই ক্ষান্ত হয় না, পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। একই সঙ্গে নারীকেও নারীর বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। এতে অল্প কিছু সুবিধাবাদী, শোষক শ্রেণি (সে পুরুষ হোক অথবা নারী) ছাড়া বাকি সবাই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হয়ত নারীরা বেশি হয় কিন্তু পুরুষেরাও কম হয় না।

এই সমস্যার সত্যিকারের সমাধান হওয়া নিশ্চয়ই অনেক সময়সাপেক্ষ, তবে শুরু করতে হবে এখনই; এবং সেটা শুরু করতে হবে নিজেকে দিয়েই। নারী-পুরুষের সহজ স্বাভাবিক সম্প্রীতি আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনের চর্চাটা পরিবার থেকেই শুরু হওয়া জরুরি। প্রথমে নিজের চিন্তায় বদল আনার চেষ্টা করতে হবে। এ চিন্তাকে আরো ছড়িয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে লেখালেখি করতে হবে, কথা বলতে হবে। অনেক চিন্তা ভুল হবে, অনেক ভাবনা পরবর্তী সময়ে বোকামি মনে হবে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা প্রাণখুলে কথা বলছি, আলাপ-আলোচনা-বিতর্ক শুরু করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই হবে না।

চিররঞ্জন সরকার ম্যানেজার, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচি, ব্র্যাক। chiroranjan@gmail.com